ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1494-1499
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

আসামের বাংলা সংবাদপত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যা

মোঃ আজিমুল হক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.06.2025; Send for Revised: 12.06.2025; Revised Received: 15.06.2025; Accepted: 16.06.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 1947, India was divided, creating two nations based on religion—on one side, West Pakistan, and on the other, East Pakistan. In 1971, the Liberation War began in East Pakistan, leading to the creation of an independent nation called Bangladesh. However, the journey from East Pakistan to independent Bangladesh was not easy. Around three million people lost their lives, and ten million sought refuges in India, primarily in Bengali-dominated regions. Those who migrated from East Bengal to India's West Bengal and northeastern states after 1947 were referred to as refugees. However, the people who arrived from East Pakistan in 1971 were primarily considered war refugees. Among the northeastern states of India, Assam witnessed the largest influx of these refugees. Numerous government camps were established to aid those fleeing their homeland. Alongside, ordinary citizens and voluntary organizations in Assam actively extended support to the refugees. Despite the goodwill of the people, the facilities provided in the camps were inadequate compared to the needs of the refugees. Assam in 1971 buzzed with issues such as inflation and concerns about espionage. After enduring nine months of hardship, a large number of refugees eventually returned to an independent Bangladesh.

Keywords: Pakistan, East Pakistan Bangladesh, Liberation war, Independence, Migration, 1971, Refugee, Partition

১৯৭১ সালে সংগঠিত মুক্তিযুদ্ধে ভারত মূলত সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় এক কোটি শরণার্থী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভয়ে ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। মূলত ভারতের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই অভিবাসন ঘটে। ১৯৭১ সালের প্রথম পর্ব থেকেই শরণার্থী আগমন শুরু হলেও ২৫ মার্চের পর থেকে প্রচুর শরণার্থী আসতে থাকে। জেনিভা কনভেনশন-এর শরণার্থীর সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, নাগরিকতা, বিশেষ সম্প্রদায় অথবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে নিপীড়নের আশঙ্কার সম্মুখীন এবং তাঁর এই আশঙ্কা উত্তম সাক্ষ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কারণে, সে যে দেশের নাগরিক তার বাইরে অবস্থান করছে এবং নিজের দেশে নিরাপত্তা পাচ্ছে না অথবা উক্ত নিপীড়নের আশঙ্কার দরুন নিজের দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর আস্থাহীন; এবং পূর্বে যে দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল, সেই দেশে ফিরতে পারছে না অথবা উক্ত নিপীড়নের আশঙ্কার দরুন সেই দেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক, তাদেরকে শরণার্থী বলা হয়।[১] তবে রিফিউজি এবং শরণার্থী কথাটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বিশেষত ১৯৭১-এর সালে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে এসেছেন তাঁরা দেশের পরিস্থিতি, পুনরায় বাসযোগ্য হয়ে উঠলে আবার ফিরে যেতে চেয়েছেন। ১৯৪৭-এর পর দেশভাগের শিকার মানুষ রিফিউজি হিসাবে ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা অনেকেই জায়গা অদলবদল করে, নয়তো বসতবাড়ি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বা একেবারে জমির উপর সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে ভারতেই বসবাস করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের

শিকার মানুষের পরিচয় একটু পরিবর্তিত হল, তাঁরা পরিচিত হন শরণার্থী নামে। বাংলাদেশ ছেড়ে যেসব মানুষ চলে এসেছিলেন তাঁর মধ্যে বেশিরভাগই আর ফিরে যাননি। শরণার্থীদের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে নিজের দেশ বাধ্য করছে দেশত্যাগ করতে। সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য অন্য দেশের দরজা খোলা, দেশভাগের উদ্বাস্তুদের জন্য যেমন রিফিউজি ক্যাম্প কলোনি তৈরি হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি হল শরণার্থী শিবির।[২] পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতের বিভিন্ন অংশে শরণার্থী হয়ে আসা বাঙালিরা জানতেন বাংলাদেশ তৈরি হয়ে গেলেই তাদের ফিরে যেতে হবে। ভারত সরকার স্থায়ীভাবে তাদের দায় নেবে না। ভারত সরকারের ১৯৪৭ সালের ক্যাম্পগুলির অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়, শরণার্থী আগমন শুরু হলে ট্রেন, বাসে করে তাদের নিকটস্থ ক্যাম্পগুলিতে নিয়ে আসা হয়।

মূলত ২৫ মার্চের পর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা শরণার্থীরা ভারতের পূর্ব-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করেছিল। আসাম রাজ্যের শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির মতো অঞ্চলগুলির মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীক শরণার্থীজনিত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন।

কুশিয়ারার নদীর পাশের জেলা সিলেট। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার কালে গণভোটে দ্বিখণ্ডিত সিলেট জেলার ভারতভুক্ত এক টুকরো প্রাপ্তভূমি হাইলাকান্দির পাশাপাশি প্রচুর শরণার্থী ১৯৭১ এ আশ্রয় নিয়েছিল করিমগঞ্জের নানা স্থানে। করিমগঞ্জের পাশাপাশি হাইলাকান্দিতে মার্চ মাসের প্রথম দিক থেকেই পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের জন্য জনগত গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কাছাড় জেলায় একাত্তর সালে দৈনিক প্রকাশিত পত্রিকা একটিও না থাকলেও সাপ্তাহিক প্রকাশিত পত্রিকা ছিল— যুগশক্তি, দৃষ্টিপাত, নবযুগ, যুগশঙ্খ,পূর্ব্বায়ণ, অগ্নিবাণ, ঘর্ঘর। একাত্তর সালের মার্চ মাসের প্রথম পর্ব থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের প্রতি কাছাড় জেলায় অবস্থিত বাঙালিদের মধ্যে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'যুগশক্তি' পত্রিকার ১২ মার্চ ১৯৭১ সালের প্রকাশিত পূর্ব-পাকিস্তান সম্পর্কিত খবরেও এই ধরণের তথ্য পাওয়া যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে গণ আন্দোলন অব্যাহত শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। উদ্বাস্তুদের আগমনে কাছাড় জেলায় অর্থনৈতিক জীবনে একটা বড় রকম আঘাত হেনেছিল। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কম পরে। করিমগঞ্জ মহকুমাতে প্রায় বত্রিশটি ত্রাণ শিবির গঠন করা হয়েছিল।[৩] পূর্ব-পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনারা করিমগঞ্জ, শিলচর প্রবেশের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, প্রচুর সংখ্যক বিপন্ন মানুষরা লাতু, মহিশাসন, সুতারকান্দি, লক্ষ্মীবাজার, লাফাসাইল, মকারকপুর, করিমগঞ্জের প্রায় প্রতিটি সরকারি স্কুলে, কলেজে শরণার্থী শিবির গড়ে উঠেছিল। করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ। শরণার্থীদের ভারতে থাকার জন্য ১৯৬৪ সালের বিদেশি নাগরিক আইন মোতাবেক পারমিট সংগ্রহের জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল। শরণার্থীদের ক্যাম্পে থাকার জন্য এবং সরকারি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য পারমিট সংগ্রহ করতে হত। করিমগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতিকে কয়েকটি সরকারি স্কুলের ক্যাম্পের পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

১৫ মে ১৯৪৬ সালের বৈদেশিক নাগরিক আইন অনুসারে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত প্রত্যেক উদ্বাস্তুকে ভারতে থাকবার জন্য পারমিট সংগ্রহের কথা বলা হয়, আসাম সরকারের এক প্রেস মিটে। আসাম সরকার কর্তৃক পারমিটের আদেশ জারি হওয়ার পূর্বে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের ১৯৭১ সালের ৩১ মে এর মধ্যে পারমিট সংগ্রহ করতে বলা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক শরণার্থীদের মুদ্রা বিনিময়ের সুযোগও দেওয়া হয়। স্টেট ব্যাঙ্কের শাখাগুলিতে পাকিস্তানি মুদ্রা জমা দেওয়া ও বিনিময়ের সুযোগ ছিল। পাকিস্তানি একশো টাকার বিনিময়ে ভারতীয় পঁচাত্তর টাকা দেওয়া হয়। সরকার এবং স্টেট ব্যাঙ্ক সুযোগ দেওয়ায় অসহায় শরণার্থীদের কাছ থেকে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী যে ভাবে উচ্চহাতে পাট্টা আদায় করতো তা বন্ধ হয়। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ও সেবার উদ্দেশ্যে 'নিবেদিতা নারী সেবা সমিতি' নামে একটি মহিলা সংস্থাসভা গঠিত হয়।[৪] একাত্তর সালের ৪ মে হাইলাকান্দি টাউন হলে প্রভাবতী রায়ের একটি মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সভাতে মূলত বাংলাদেশ জঙ্গি শাসকের বর্বরচিত অত্যাচার ও গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কাছাড় জেলার কিছু প্রগতিশীল নারী। সভানেত্রী ছিলেন শ্রী প্রভাকর রায়, সহসভানেত্রী সুবর্ণ ধর, সম্পাদিকা ছিলেন শ্রী ফুল্লরা চক্রবর্তী, সম্পাদিকা দ্বয় শ্রী বীণাপাণি সিংহ ও শ্রী রমা সেনগুপ্তা ও কোষাধ্যক্ষা নীহার দেবী। ১২ মে ১৯৭১ সালে 'সাপ্তাহিক পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর অনুসারে মে মাস পর্যন্ত কাছাড় জেলায় আগত শরণার্থীদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ হাজার। করিমগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন শিবিরে অবস্থানকারীর সংখ্যাই ছিল প্রায় আঠারো হাজার। শিলচর এবং হাইলাকান্দির শরণার্থী শিবিরগুলিতেও শরণার্থী সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছিল। শরণার্থীদের একটি বিরাট অংশ, শিবিরের বাইরে আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে বসবাসরত

হওয়ায়, তাদের অনেকের নামই সরকারিভাবে রেজিস্ট্রার হয়নি। ফলে ধারণা করা যেতে পারে, প্রকৃত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল সরকারি হিসাবের চেয়েও আরও বেশি।[৫] কাছাড় জেলার লাতু সীমান্ত দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আগমন ঘটেছিল। একাত্তর সালের জুন মাসেও আসাম-এর কাছাড় প্রদেশের নানা অঞ্চলে শরণার্থী আগমন অব্যাহত ছিল। 'যুগশঙ্খ' পত্রিকায় জুন মাসে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, জুন মাস পর্যন্তই হাইলাকান্দিতে প্রায় ১৫ হাজার শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। শরণার্থী আশ্রয় দানে মহকুমার প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল পরিপূর্ণ। হাইলাকান্দি মহকুমা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরবর্তী লক্ষীনগর শরণার্থী শিবিরে প্রায় ৭৫০০ জনকে আশ্রয় দেওয়ার উপযোগী হলেও কমপক্ষে দশহাজার মানুষকে আশ্রয় দেওয়ার সরকারি তরফে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। লক্ষ্মীনগর শিবিরটির নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে ফাঁকা করে, শরণার্থীদের লক্ষীনগর শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হবে। শরণার্থীদের পাশাপাশি, শরণার্থী পরিচয়ে পাক গুপ্তচরদের খবরেও শরণার্থী শিবিরে সামান্য কিছু শান্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটেছিল একাত্তর সালে। ২৩ জুলাই ১৯৭১ সালের যুগশক্তি পত্রিকায়, এই বিষয়ে একটি খবরও প্রকাশিত হয়। 'গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সহ পাক গুপ্তচর ধৃত' শীর্ষক সংবাদে লেখা হয় 'চুড়খাইয়ের পাক গুপ্তচর তছির আলী পীর সেজে ভারতে এলে, নিরাপত্তা বাহিনী তাকে নগদ ৮০০ টাকা গোপন গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র সহ ধৃত করেন।[৬]

একাত্তর সালের মাঝামাঝি এসে গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতারির সংখ্যা যেমন বাড়ছিল শরণার্থীদের আগমনও ঘটেছিল তেমনি। জুন মাসে চন্দ্রনাথপুরে (শিলচর) স্থায়ী শরণার্থী শিবির স্থাপিত হয়। তিনটি পর্যায়ে প্রতিবার প্রায় পাঁচ হাজার করে ১৫ হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শহরাঞ্চল থেকে শরণার্থীদের প্রথমে সেখানে আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শরণার্থী শিবিরগুলিতে বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু বহু মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেচ্ছাসেবকদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে শিবিরে নথিভুক্ত না হওয়া শরণার্থীদের খুঁজে বার করার। একাত্তর সালে আসামে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ও বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ব্যবস্থাদি সংক্রান্ত নতুন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন শ্রী এস কে মল্লিক। সীমান্তবর্তী জেলার বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে, অল্পসময়ের মধ্যে পরিচ্ছন্ন কিছু কিছু শরণার্থী শিবির নির্মাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত আসামে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫০০০ জন। ১৬ জুন ১৯৭১ সালের 'যুগশঙ্খ' পত্রিকাতে 'আসামের সীমান্ত স্থানগুলিতে শরণার্থীদের জন্য নতুন নতুন অস্থায়ী শিবিরের পরিকল্পনা' শিরোনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছিল, সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রী মল্লিক বলেছিলেন শরণার্থী শিবিরগুলি মিজো জেলা কাছাড়ে স্থাপন করা হবে। শ্রী মল্লিকের মতে আসামের মোট শরণার্থী ১১৫০০০ এর মাত্রাকে ছাড়িয়ে যাবে, তবে ৪০০০০ এর মতো শরণার্থী বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন, পরিচিতের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। প্রায় আড়াই কোটি টাকা এই শরণার্থী শিবিরগুলিতে ব্যবহার করা হবে মনে করা হয়েছিল। প্রতিটি শরণার্থী শিবিরে ৫০০০ শরণার্থী থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রতিটি শিবিরেই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন শ্রী মল্লিক। ভারতে শরণার্থীদের অবস্থান এর কারণে ভারত সরকারকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছিল।[৭] ৫ নভেম্বর ১৯৭১ সালে 'যুগশক্তি' সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'করিমগঞ্জে শরণার্থী আগমন অব্যাহত'। প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়—

> "সীমান্ত অতিক্রম করে এখনও প্রতিদিন এখনও প্রতিদিন অসংখ্য শরণার্থী করিমগঞ্জে আসছেন। ট্র্যানজিট ক্যাম্পে পাঁচ হাজারের বেশি শরণার্থী রয়েছেন। কালীগঞ্জে নতুন শিবির নির্মাণের কাজ শেষ যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অবিলম্বে আরও নতুন শিবির নির্মাণের ব্যবস্থা না হলে গুরুতর আকার ধারণ করবে।"[৮]

বিভিন্ন রাজ্যে শরণার্থী সংখ্যা বিষয়ক একটি পরিসংখ্যান ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে 'যুগশঙ্খ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'নিম্নে উক্ত পরিসংখ্যানটি উল্লেখ করা হল গত সাত মাসে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবেশী চারটি রাজ্যে শরণার্থী আগমনের সংখ্যা নিম্নরূপ—

আসাম - ৩০ হাজার
মেঘালয়- ৭০ হাজার
ত্রিপুরা- ১০ লক্ষ ৪০ হাজার

পশ্চিমবাংলা- ৭০ লক্ষ ১০ হাজার

ভারতের চারটি রাজ্যে শরণার্থী আগমনের শতকরা হিসাব—

আসাম- ৩ শতাংশ

মেঘালয়- ৬ শতাংশ

ত্রিপুরা- ১৬ শতাংশ

পশ্চিমবাংলা- ৭৬ শতাংশ [৯]

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আসামের পাশাপাশি মেঘালয় সীমান্তেও প্রচুর শরণার্থী আগমনের ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। ৭১ সালে কিছু সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছিল ত্রিপুরা ও আসাম থেকে শরণার্থীদের, আসামের ক্যাম্পগুলিতে নিয়ে আসা হবে। ত্রিপুরা থেকে ৫০ হাজার ও মেঘালয় থেকে প্রায় ১৫ হাজার শরণার্থীকে নিয়ে আসা হবে দাবি করা হলেও, আসামের পূনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী যোগেন চৌধুরীর ভাষ্য মতে কেবল ত্রিপুরা থেকেই শরণার্থীদের আসামে নিয়ে আসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই শরণার্থীদের সাহায্যার্থে, আসামের সর্বস্তরের মানুষেরা এগিয়ে এসেছিলেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু সংস্থা, কমিটি ও ব্যাক্তির নাম উল্লেখের চেষ্টা করা হয়েছে—

১) বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি: - শিলচরের বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি শরণার্থীদের সাহায্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এই কমিটির একটি অনুষ্ঠান স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন বিখ্যাত উকিল ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব ইমাদ উদ্দীন বুলবুল ও শংকর রায় চৌধুরী শিলচর জেলার সাধারণ তরুণ-তরুণীরা এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে যোগদান করেছিলেন। ইমাদ উদ্দীন বুলবুল এর ভাষ্য মতে

> “আমরা প্রায় এক বছর ধরে এই সভার সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তবে ১৩ ডিসেম্বরের ঐ সভাটার কথা বিশেষভাবে মনে আছে। বাংলাদেশের শহীদ ও মুক্তিফৌজের বীর বাহিনীর উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করে, শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম আমরা।”[১০]

২) শরণার্থী ত্রাণে করিমগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটি:- শরণার্থীদের সাহায্যার্থে করিমগঞ্জ রেডক্রস সোসাইটি প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিলো। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে রেডক্রস সোসাইটির করিমগঞ্জ শাখার সম্পাদক ডাঃ অমলেন্দু দাস তাঁর একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, রেডক্রস সেবা কার্য্য শুরু করার প্রথম দুমাস পর্যন্ত বাইরে কোন কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী নেওয়া হয়নি। প্রথম দুমাস ঔষধপত্র ও শিশুদের পন্য নগদ দিয়ে বাজার থেকে কেনা হত। জিনিসপত্রের দুষ্পাপ্য তার মধ্যেও, সংগ্রহ কার্য চলত। প্রসূতি মায়েদের ও রোগীদের দৈনিক দুধ বিতরন করা হতো রেডক্রসের তরফ থেকে।[১১] আসামের প্রায় ৫২ টা শিবিরে দুধ বিতরণ করা হত। যুগশক্তিতে প্রকাশিত ১৯৭১ সালের ৫ নভেম্বরের একটি প্রতিবেদন থেকে করিমগঞ্জের রেডক্রস সোসাইটির বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়—

> “বর্তমানে ৬ টা শিবিরে শরণার্থীরা কেন্দ্রীভূত হয়েছেন, এবং ঐ শিবিরগুলিতে প্রায় ৩৭ হাজার শরণার্থী আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। আমরা গত আড়াইমাস যাবৎ ২টি শিবিরের সমস্ত রোগীদের সেবাকার্য্য চালাইয়া যাইতেছি। পোশাক পরিচ্ছদ আমরা খুব অল্পই পাইয়েছি। যাহা পাইয়াছিলাম তাহাও সুষ্ঠ ভাবে শরণার্থীদের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। বেতনভুক্ত কোন কর্ম্মী নাই। মুষ্টিমেয় কর্মী কয়েকজনকে দৈনিক ভাতা দেওয়া হইতেছে।”[১২]

৩) সিভিল ডিফেন্স ও দেবনাথ দাস:- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধীর কথায় করিমগঞ্জে এসেছিলেন দেবনাথ দাস। দেবনাথ দাস ছিলেন, নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর কর্নেল। মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের স্মৃতিকে স্মরণ করতে শিলচরের বিখ্যাত ‘বার্তালিপি’ পত্রিকাতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে অনেকেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন রবীন্দ্র আদিত্য, প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরীর মতো বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে। করিমগঞ্জ শহরে একাত্তর সালে ছিলো ২৩ টি ওয়ার্ড। প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ডনদের সঙ্গে দেবনাথ দাস কথা বলেছিলেন, তাদের বুঝিয়েছিলেন সিভিল ডিফেন্সের গুরুত্ব। যুদ্ধ তখন প্রায় আগত, সারা শহর জুড়ে, প্রচুর শরণার্থীদের চাপ তখন তরুণ-তরুণীদের ঐক্যবদ্ধ করে, সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং শরণার্থীদের সাহায্য করতে তিনি সিভিল ডিফেন্স গড়ে তুলতে চেয়ে ছিলেন।[১৩]

৪) করিমগঞ্জে বিশিষ্ট সাংবাদিকদের ভ্রমণ:- শরণার্থীদের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শনের জন্য একাত্তর সালের ৩ মে, শিলং ও গোহাটির একদল সাংবাদিক করিমগঞ্জ শহর ও সীমান্ত অঞ্চলে আসেন। সেই দলে ছিলেন, 'আসাম ট্রিবিউন' এর সম্পাদক শ্রী সতীশচন্দ্র কাকতি, গৌহাটি 'নীলাচল' এর সম্পাদক শ্রী হোসেন বরগোঁহাই, 'শিলং টাইমস' এর সম্পাদক শ্রী পার্শনান চৌধুরী। 'নবভারত' সম্পাদক শ্রী প্রদোষ চৌধুরী প্রভৃতি খ্যাতনামা সাংবাদিক। আমেরিকান সাংবাদিকরা ও অন্য দুইজন সাংবাদিক ও একইসঙ্গে করিমগঞ্জ ভ্রমণ করেছিলেন। এই সাংবাদিকরা শরণার্থীদের প্রকৃত অবস্থা জনসাধারনের সামনে তুলে আনতে সাহায্য করেন।

শিলচরের বাজারগুলিতে নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়েছিল। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়

> "কালীগঞ্জে সম্প্রতি কেরোসিন তেলের অভাব দেখা দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে ১.৫০ পয়সা লিটার দরে কেরোসিন বিক্রয় হচ্ছে। খবরে প্রকাশ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ যদিও নির্ধারিত মূল্যেই করিমগঞ্জ থেকে কেরোসিন পান কিন্তু ক্রেতাদের থেকে অধিক দাম আদায় করে থাকেন। কোন কোন ব্যবসায়ীর গুদামে কেরোসিন মজুদ আছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।"[১৪]

বেবিফুড ও কেরোসিন সংক্রান্ত সমস্যা যে প্রথম থেকেই জটিল রূপ ধারণ করেছিল। তার পরিচয় পাওয়া যায় ২১ আশ্বিন 'যুগশক্তি' প্রকাশিত 'বেবিফুড ও কেরোসিন বাজার থেকে উধাও' নামের খবরে। আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকাগুলির অভিযোগ ছিলো, সরকার কোন কার্যকারী ভূমিকা পালন না করায়, খোলা বাজারে একাত্তর সালে, চিনি প্রতি কেজি ৬ টাকা ও কেরোসিন ২ টাকা লিটারে বিক্রয় হচ্ছিল, যা ছিল বাজার মূল্যের চেয়ে অনেকটা বেশি।[১৫] তবে সরকারি সুযোগ সুবিধা থাকলেও শরণার্থী শিবিরগুলিতে অবস্থিত মানুষদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেধেছিল। যেমন নাগাল্যান্ড সরকার কর্ত্তৃক শরণার্থীদের বহিস্কৃত করার অভিযোগ উঠেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের সাতজন শরণার্থী কোহিমায় আশ্রয় চাইলে সরকার তাদের বহিস্কার করেন। শরণার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে থাকতে দেওয়া হয়নি, কোহিমার 'নাগাল্যান্ড টাইমস' এ খবর প্রকাশিত হয়েছিল ১৬ জুলাই ১৯৭১ সালে 'যুগশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল 'নাগাল্যান্ড থেকে আরও ৬১ জন শরণার্থী বহিস্কৃত।' নাগাল্যান্ডের ডিমপুরে বসবাসরত শরণার্থী কার্ড নিয়ে বসবাসরত ৬১ জন শরণার্থীকে নাগাল্যান্ড সরকার বহিষ্কার করেছিল। গিরীশগঞ্জ শরণার্থী শিবির সম্পর্কেও একাত্তর সালে নানা অভিযোগ উঠেছিল। গিরীশগঞ্জ শরণার্থী শিবিরের আবাসিকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠিতে বেশ কয়েকটি অভিযোগ করে কতৃপক্ষকে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলার অনুরোধ করা হয়েছিল, অভিযোগ গুলি ছিল—

১) প্রত্যেক সপ্তাহে রেশন বিলির দিন চলে যাওয়ার পর ও রেশন বিলি করা হত না শরণার্থীদের। আবার রেশন না পাওয়ার দিনগুলির রেশন পরে আর বিলি করা হয় না।

২) রেশন নির্দিষ্ট দিনের একদিন পরে বিলি করলে, সাত সপ্তাহের পর এক সপ্তাহের রেশন বেশি হয়। কিন্তু শরণার্থীদের অভিযোগ ছিল, গিরীশগঞ্জ শিবিরে এমন ভাবে রেশন বিলি করা হত যে তিন/চার সপ্তাহে এক সপ্তাহের বেশি হতে থাকে। বেশি সেই রেশন রাতের অন্ধকারে অন্য জায়গাতে পাচার করা হত।

৩) ক্যাম্পে রেশন আনার মুখের রাস্তায় কিছু পরিমাণে রেশন নামিয়ে রাখা হত, ফলে প্রয়োজনের তুলনায় কম রেশন ক্যাম্পে এসে পৌঁছাত।[১৬]

শরণার্থী শিবিরগুলিতে, ব্যক্তিগত সাহায্যে, রেডক্রস এর ডাক্তাররা চেষ্টা করলেও কলেরা অনেকক্ষেত্রে মহামারী হিসাবে দেখা দিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকটি শিবিরেই বহন ক্ষমতার থেকে বেশি লোক বসবাস করছিল। ফলে ক্যাম্পগুলির অবস্থা ছিল আশঙ্খা জনক। শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জের পাশাপাশি মেঘালয়ের ক্যাম্পগুলির অবস্থাও ছিল অত্যন্ত করুণ। 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় ১১ শ্রাবণ ১৩৭৮ এর সংখ্যার একটি প্রতিবেদনে, শরণার্থী জীবনের একটি করুণ ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল। মেঘালয়ের মানাই শরণার্থী শিবিরের অমিয়বালা গোস্বামী ও প্রভাবতী ব্যানার্জী নামে দুজন বিধবা ভদ্র মহিলা হাইলাকান্দিবাসী তাদের জনৈক আত্মীয়ের কাছে তাদেরকে ক্যাম্প থেকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে করুণ আবেদন জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী প্রভাবতী ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্র কলেরাতে মারা গিয়েছিলেন। মানাই শিবিরে শরণার্থী মহিলাদের রেজিস্ট্রেশন নং ছিল যথাক্রমে ৩৯৫০ ও ৩৯৪১।[১৭]

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ গঠনের পথ সহজ ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যে বিশাল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে বসবাস করেছিলেন, তাদের ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের শ্রম ও পুনর্ব্বাসন মন্ত্রকের মন্ত্রী শ্রী আর, কে খাদিলকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই শরণার্থীরা নিজেদের দেশে ফিরে আসা শুরু করেছিল। বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার শরণার্থী ভারতীয় শিবিরগুলি ছেড়ে দেশে ফিরে গেছেন বলে তিনি জানিয়েছিলেন।[১৮] ৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে 'পূর্ব্বায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর থেকে শ্রীহট্ট শহরের গিরিশরাজা স্কুলে ভারত থেকে প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্প স্থাপন করার বিষয়ে জানা যায়। দৈনিক প্রায় ১ হাজার শরণার্থী নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন।[১৯]

আসাম শরণার্থী আগমন থেকে শুরু করে শরণার্থীদের নিজ দেশে ফেরত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস দীর্ঘ। শরণার্থী আগমনের ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মীয় উস্কানি দান, সরকারি অব্যবস্থার অভিযোগ, ডাক্তারের গাফিলতিতে শিশু মৃত্যু সহ কেরোসিন চাল, কম্বল, বেবিফুড পাচারের অভিযোগ যেমন ছিল, তেমনি এসব তুচ্ছ করেছিল সমাজের একটি বড় অংশের মানুষের সাহায্যে। সরকার কর্মী থেকে, সাংস্কৃতিক কর্মী, ছাত্ররা, শিক্ষকরা ব্যক্তিগত, কখনও সংস্থাগত সাহায্য করেছেন। প্রচুর মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মীয়দের বাড়িতে আবার অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয় পেয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

১. আন্তর্জালিক সূত্র - https://nagorikvoice.com
২. আহমদ, শরীফ। মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ, গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্। খুলনা, প্রথম প্রকাশ-২০২০
৩. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ১২ মার্চ, ১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ৩।
৪. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১৯ মে, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ১।
৫. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১২ মে, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ১।
৬. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ২৩ জুলাই,১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ২।
৭. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১২মে, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ৩।
৮. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ২।
৯. যুগশঙ্খ, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১, শিলচর, আসাম, পৃ: ৪।
১০. ঈমাদ উদ্দীন বুলবুল, আসাম, শিলচর, ২৩.০৮.২৩
১১. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ৫ নভেম্বর,১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ২।
১২. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ৫ নভেম্বর, ১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ২।
১৩. বার্তালিপি, ২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২২, শিলচর।
১৪. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ৩।
১৫. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ৮ অক্টোবর, ১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ৩।
১৬. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ২২ অক্টোবর, ১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ৩।
১৭. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১ আগস্ট, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ৩।
১৮. যুগশক্তি (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শ্রী বিধুভূষণ চৌধুরী, ডিসেম্বর, ১৯৭১, ৩৪শ বর্ষ, করিমগঞ্জ, পৃ: ৩।
১৯. পূর্ব্বায়ণ (সাপ্তাহিক), সম্পাদক-শক্তিধর চৌধুরী, ১ আগস্ট, ১৯৭১, ২য় বর্ষ, হাইলাকান্দি, পৃ: ৩।